অধ্যাপকের আত্মকথা

সুনীল রায় চৌধুরী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে ৬৫ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর বাড়ি এসে দেখলাম টেবিলের ওপরে অনেকগুলি চিঠি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেট বুক বোর্ড এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৫টি বই ঃ অর্থনীতি ও জনপ্রশাসন সম্পর্কে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমা দিতে হবে। কাজটি যে কত বিরাট এবং কঠিন প্রথমে তা বুঝতে পারিনি। মোট সময় লাগলো ৫ বছরেরও বেশি।

এই কাজটি শেষ করার পর হাতে নিলাম "অধ্যাপকের আত্মকথা" নামে এই বইটি লেখার দায়িত্বভার। স্কুল ও কলেজ জীবনের সহপাঠি বহু বন্ধু, সহকর্মী বহু অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা, বিরাট সংখ্যক আত্মীয়-স্বজনযাঁদের নাম বা পরিচয় এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তাঁদের সকলের অনুরোধের চাপে অবশেষে ৭/৮ বছরের চেষ্টায় বইখানি লেখা ও ছাপা শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে মস্ত বড়ো একটি ঘটনাও ঘটে গেল। আমার স্ত্রী সুলেখা ২০০৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে হঠাৎ এক রাত্রে চলে গেলেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে। বইখানি তাঁকেই উৎসর্গ করছি।

এই বইটি ছাপার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এবং যাঁর আগ্রহ ছাড়া এটি সম্ভবত প্রকাশিত হতে পারতো না, পুনশ্চ প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়ককে অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অন্য দুজন সাহিত্যিক বন্ধু, শ্রীবিষ্ণু বসু ও শ্রীঅশোককুমার মিত্র, যাঁরা নিজেদের কাজ ফেলে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বয়সের চাপে হয়তো অনেক ভুলত্রুটি থেকে গেছে, যার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের সকলের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

গলফ্‌গ্রীণ, কলকাতা
১ জানুয়ারি, ২০০৮

সুনীল রায়চৌধুরী

সূচিপত্র

শৈশব ও কৈশোর	১১
ছাত্রজীবন : স্কুল স্তর	১৬
ছাত্রজীবন : কলেজ স্তর	২২
ছাত্রজীবনের শেষ ভাগ ও কর্মজীবনের আরম্ভ	৩০
শিক্ষা প্রশাসনে যোগদান এবং এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা	৫৪
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদে নতুন জীবন-ধারা	৬৭
প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ	৬৯
বিনামেঘে বজ্রাঘাত ঃ সুলেখার আকস্মিক মহাপ্রয়াণ	৮৩
পারিবারিক জীবন	৮৫

॥ ১ ॥

জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ মনে হচ্ছে আমার এই দীর্ঘ জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছুটা লিখে রেখে যাই। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। ইংরেজি ও বাংলায় বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ গত প্রায় ৪০ বছর ধরে লিখলেও ঠিক এই ধরনের লেখা ছাত্রজীবনের পর আর চেষ্টা করিনি। তাই স্বভাবতই মনে কিছুটা দ্বিধা ও সংশয় রয়ে গেছে।

শৈশব ও কৈশোর

শৈশব ও কৈশোরের কথা অস্পষ্টভাবে মনে আছে— বেশিটাই মা-বাবা ও বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনের কাছে শোনা। উত্তর কলকাতায় এক ভাড়া বাড়িতে জন্ম, বাবা (শ্রদ্ধেয় মহীতোষ রায়চৌধুরী) তখন কলকাতায় চাকরি করেন— সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ও বঙ্গবাসী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। এখনকার পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, তখন সাংবাদিক ও শিক্ষকবৃন্দের যে বেতনহার চালু ছিল তাতে দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুটি করে চাকরি না করলে কলকাতায় সপরিবারে বাসা ভাড়া করে থাকার কোনো প্রশ্নই ছিল না। আমার শৈশবের একটা বড়ো অংশই তাই কেটেছে দেশের বাড়িতে মা ও ভাইবোনেদের সঙ্গে যশোর জেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ)। কলকাতা থেকে গঙ্গানন্দপুর যাওয়াটা তখন খুবই সহজ ছিল। বিকালে ৪-৪০ মিনিটে শেয়ালদা থেকে ছাড়ত বরিশাল এক্সপ্রেস। শেয়ালদা থেকে ছেড়ে বরিশাল এক্সপ্রেস প্রথমে থামত বনগাঁ স্টেশনে এবং সেখান থেকে আর এক দৌড়ে পৌঁছোত ঝিকরগাছা ঘাট স্টেশনে, সময় লাগত মাত্র ২ ঘণ্টা, দূরত্ব ছিল প্রায় ৬৭ মাইল। এখান থেকে আর মাত্র ২০ মিনিটে ট্রেনটা যশোর স্টেশনে পৌঁছে যেত, তারপর রাত নটা নাগাদ আর এক জেলা সদর খুলনা এবং সেখান থেকে স্টিমারে রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল নাগাদ বরিশাল। ঝিকরগাছা ঘাট স্টেশনটি ছিল একেবারে কপোতাক্ষ নদের ওপর, এর একদিকে স্টিমার সার্ভিস ছিল মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি পর্যন্ত বা তার পরেও আর কিছুটা। অন্যদিকে জল কিছু কম

থাকায় স্টিমার চলত না, তাই আমাদের গ্রাম গঙ্গানন্দপুর যেতে হত দেশি ছইওয়ালা নৌকায়। ঝিকরগাছা থেকে গঙ্গানন্দপুর এই ৬ মাইল পথে নদীর দু'ধারে ছিল বেশ কয়েকটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, যাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল অমৃতবাজার, যেখান থেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দৈনিক সংবাদপত্রের অন্যতম অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত। কপোতাক্ষ নদের জল ছিল অদ্ভুত পরিষ্কার, এত স্বচ্ছ যে উপর থেকে তলা পর্যন্ত আয়নার মতো দেখা যেত।

গঙ্গানন্দপুরেই আমার লেখাপড়ার শুরু। আমার বাবা ওই গ্রামেই একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেছিলেন স্থানীয় ছাত্রদের সুবিধার জন্য। স্কুলটি পরবর্তী কালে দেশবিভাগের কিছু আগে ১৯৪৬ সালে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে উন্নীত হয়।[১] শিক্ষার বিস্তার সম্ভবত তাঁর একটি নেশা ছিল। এজন্যই ১৯৪১ সালে যশোর শহরে তিনি মাত্র কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যেটি আজ বাংলাদেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছে।[২] বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে "কলেজটি বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না, মাত্র কয়েক মাস আগে সরকারি চাকরি থেকে পাকাপাকিভাবে অবসরগ্রহণের পর ৫০ বছরেরও বেশিদিন না-দেখা আমাদের গ্রাম, যশোর শহর, গ্রামের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, মাইকেল মধুসূদন কলেজ, জেলা স্কুল এবং আরও কিছু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যাদের সঙ্গে দেশবিভাগের আগে যৌবনকালে আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, সেগুলি দেখবার প্রচণ্ড আগ্রহ ও তাগিদ উপেক্ষা করতে না পেরে ২খানি চিঠি লিখে পাঠাই নাম-না-জানা গঙ্গানন্দপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও মাইকেল মধুসূদন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে। চিঠি লেখার পর একমাস কোনো খবর না পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম এ ব্যাপারে তাঁদের তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু তার কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকগুলি চিঠি ও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের মাধ্যমে জানতে পারলাম বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসন, যশোর জেলার অগণিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বেশ কয়েকটি সমাজসেবী সংস্থা অবিলম্বে আমাকে সপরিবারে যশোর ও খুলনায় আসার জন্য গভীর আন্তরিকতার

১. কাজি শওকত শাহি সম্পাদিত "শিক্ষালয়ের ইতিকথায় যশোর" (প্রথমখণ্ড) পৃ : ১৫১-২

২. "শিক্ষালয়ের ইতিকথায় যশোর" পৃ. ২৭৭-২৮৫

সঙ্গে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। থাকার ব্যবস্থা, যানবাহনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ কত টাকা আমি সঙ্গে নেব জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা রীতিমতো মনোক্ষুণ্ণ হলেন এবং জানালেন, বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখার পর থেকেই আমি বা আমরা বাংলাদেশের (অর্থাৎ শুধু সরকারের নয়, স্থানীয় সব মানুষের) অতিথি হব ও আতিথ্যের সব ব্যয়ভার তাঁরাই গ্রহণ করবেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনটিতে বেনাপোল বর্ডারে পৌঁছে দেখলাম আমাদের গ্রামের ও যশোর শহরের কয়েক'শো মানুষ অন্ততপক্ষে ১৫/২০ খানা গাড়িসহ ৩/৪ ঘণ্টা আমার জন্য গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। সাংবাদিক সম্মেলন দিয়ে শুরু হল আমার কর্মসূচি এবং আমার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ (অবশ্যই আমার পিতৃদেবের পরিচয় সহ, যাঁকে বাংলাদেশের যশোর-খুলনার মানুষ আজও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বড়োবাবু' বলে উল্লেখ করেন) একটি বিজ্ঞপ্তি সকলের মধ্যে বিতরণ করা হল যার শুরুতেই আমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই ভাবে "১৯৫৩ সালে তিনি মওলানা আজাদ কলেজে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। তাঁর কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের আগের বছর আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঐ কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন।" একথা আমি কাউকে না জানালেও বাংলাদেশের গবেষক-শিক্ষক বন্ধুবর্গ বহু চেষ্টায় তথ্যটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই আরও একধাপ এগিয়ে তাঁরাই ঘোষণা করলেন আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান সাহেবের শিক্ষকস্থানীয়, অতএব তাঁদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এর পরেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাতে এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হবার একান্ত আন্তরিক অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত যে কর্মসূচি তৈরি হয় তাতে দেখা যায় পূর্ব-নির্ধারিত তিনদিনের জায়গায় অন্তত ছয়দিন আমাকে ওখানে থাকতেই হবে এবং প্রতিদিন অন্তত ৫/৬টি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। কলকাতায় স্ত্রী একা রয়েছেন এবং খবর না পেলে তিনি খুব চিন্তিত হবেন, একথা বলামাত্র রাত ১১টায় অনেক চেষ্টার পরে কলকাতায় আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন উদ্যোক্তারাই এবং স্ত্রীকে সঙ্গে না আনার জন্য বিশেষভাবে অনুযোগ জানান ও প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন, আগামী বছর অন্তত ৭ দিনের জন্য সস্ত্রীক আবার আসতেই হবে! সম্বর্ধনা সভাগুলিতে যে কী বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল, তা কল্পনা করাও কঠিন। গঙ্গানন্দপুর গ্রামে একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ১ বছর আগে আমাদেরই দেওয়া ৫/৭ বিঘা জমিতে। কলেজটি তখনও সরকারি স্বীকৃতি বা অনুমোদন পায়নি। ঐ সম্বর্ধনা

সভাতেই প্রধানমন্ত্রী মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় জনসমক্ষে ঘোষণা করেন, অবিলম্বে কলেজটিকে সরকারি অনুমোদন ও স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং পরের মাস থেকেই অধ্যাপকবৃন্দের ও কর্মীদের মাহিনা ইত্যাদি বাবদ খরচ মেটানোর জন্য সরকারি অনুদান আসবে। কলেজের জন্য নির্মিত নতুন ভবনটির উদ্বোধনও আমাকে দিয়েই করানো হয় এবং আমার বাবার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য ভবনটির নামকরণও করা হয় তাঁর নাম অনুসারে। সমস্ত ব্যাপারটি চোখে না দেখলে শুধু অপরের মুখের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে দেশবিভাগের পঞ্চাশ বছর পরেও প্রতিবেশী একটি মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র এতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছে একজন জনদরদি ও শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী হিন্দু শিক্ষাবিদের প্রতি!

গঙ্গানন্দপুর হাইস্কুলে পরের দিন অনুরূপ একটি বিশাল জনসভায় আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং বাংলাদেশের একটি অনুন্নত এলাকায় ছোটো একটি গ্রামে ৫২ বছর আগে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। শুনে আরও ভালো লাগল যে আমাদের বসতবাটি ও তৎসংলগ্ন বিরাট এলাকা— অন্ততপক্ষে ১০০ বিঘা তো হবেই— থেকে এক ছটাক জমিও কোনো মুসলিম আমাদের বিনানুমতিতে গত ৫০ বছরের মধ্যে বলপূর্বক দখল করে নেননি। সবই খুব ভালো লাগল, স্থানীয় মানুষের আগ্রহ ও ভালবাসা তার মধ্যে প্রধান, কিন্তু হতাশ হলাম কপোতাক্ষনদের বর্তমান অবস্থা দেখে— হাঁটুজলও নেই এবং যেটুকু জল রয়েছে, তা কচুরিপানায় পুরোপুরি ঢাকা! কপোতাক্ষ নামটিও এখন তাই অর্থহীন হয়ে পড়েছে! তবে ২দিন পরে যশোর থেকে স্থলপথে মধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি গিয়ে অনেকটা স্বস্তি পেলাম এই দেখে যে সেখানে এখন স্টিমার সার্ভিস না থাকলেও কপোতাক্ষের জল যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবং মধুসূদনের পারিবারিক বাসগৃহটি বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ করে সেখানে একটি জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন এবং দেশবিদেশের বহু কবিতা-প্রেমিক মানুষ প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সেখানে এসে মধুসূদনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন।

যশোরের অন্যান্য যে সব শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সম্বর্ধনা জানানো হল পরের দু'দিন তার মধ্যে অবশ্যই ছিল যশোর জিলা স্কুল (যেখানে ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসে আমি কিছুদিন স্কুলের ছাত্র না হয়েও স্কুলের ছাত্রবাসে ছিলাম এবং ১৯৪২ সালে জিলা

স্কুল কেন্দ্র থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই এবং সারা বাংলা ও আসামের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চতুর্থস্থান অধিকার করে স্কুলের মুখোজ্জ্বল করি।), মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর সুরবিতান সংগীত একাডেমি, চারুপীঠ (শিল্পকলা প্রতিষ্ঠান), যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি (অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ (যশোর জেলা শাখা), শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র (যশোর জেলা শাখা), যশোর চাঁদের হাট (সাহিত্য সাময়িকী কোরক পত্রিকার প্রকাশন সংস্থা), শিক্ষা সন্দীপন (শিক্ষাবিস্তার ও মেধা অন্বেষণে নিয়োজিত একটি সক্রিয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি। জেনে খুব আশ্চর্য হলাম যে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে একমাত্র যশোর জেলাতেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯৪টি।[৩] আরও আনন্দের কথা, এইসব পূজায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মীবৃন্দ। সব কিছু দেখে মনে হয় বাংলাদেশ এখন আর শুধুমাত্র একটি মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র নয় যেখানে হিন্দুদের কোনো অধিকার ও নিরাপত্তা নেই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকবৃন্দ আজ বাংলাদেশে পরস্পরকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং পশ্চিম বাংলা থেকে আগত হিন্দু ভাইদেরও তাঁরা সমানভাবেই আলিঙ্গন করছেন। জানি না এই ব্যবস্থা কতদিন চলবে, কিন্তু যত বেশিদিন এ অবস্থা চালু থাকবে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রই তা থেকে উপকৃত হবেন।

এইসব সম্বর্ধনা সভায় উপহার দেওয়া হয়েছিল বহু স্মৃতি-স্মারক, অসংখ্য বই ও পত্রিকা, স্থানীয় শিল্পকলার নমুনা এবং আরও মজার কথা, আমার ফেরার দিন সকালে আমার স্ত্রীর জন্য অসাধারণ সুন্দর ২টি শাড়ি উপহার, কয়েক হাঁড়ি পাটালি, মোয়া, ক্ষীরের কচুরি, এমনকি ২টি বিরাট যশোরের অতি সুস্বাদু কচু। এত জিনিস নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় একথা বলামাত্র হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন উপস্থিত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা। শেষ পর্যন্ত স্থির হল বর্ডার পর্যন্ত এইসব উপহারের কিছু কিছু নমুনা নিয়ে সঙ্গে যাবেন কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু এবং বর্ডারের অন্যদিক থেকে একটি গাড়িভাড়া করে সোজা দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাড়ি পর্যন্ত আসা। অগত্যা তাতেই রাজি হতে হল। এমন অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত আমার জীবনে কখনও ঘটেনি। শরীর সুস্থ থাকলে ভবিষ্যতে আবার বাংলাদেশে যাবার ইচ্ছা রইল।

---

৩. বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, যশোর জেলা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা "অঞ্জলি" থেকে সংগৃহীত।